ভয় – নির্ভয় আহমেদ সাবের

মোসাদ্দেক আলী বারডেম হাসপাতালে ভাইপো শওকতকে দেখতে এসেছিলো। ক্লাস ফোরে পড়ুয়া ছেলে শওকতের পরশু রাতে হুলুস্থুল রকমের জ্বর এসেছিল। গত দেড় দিন ধরে অবিরাম জল পট্টি আর অষুধ দিয়েও জ্বর একশ তিন-চারের নীচে নামানো যাচ্ছে না। পারবারিক ডাক্তার ধরতে পারছেন না, ব্যাপারটা কি। তাই পরামর্শ দিয়েছেন, কোন হাসপাতালে ভর্তি করে ভালো মত চেক আপ করাতে। মোসাদ্দেক আলীরা পুরানো ঢাকার আদি বাসিন্দা। সম্পর্ক টানলে ঢাকার নবাব বংশের আত্মীয়। আরমানীটোলায় পৈত্রিক বাড়ী। ইসলামপুরে কাপড়ের পাইকারী ব্যাবসা আছে বংশানুক্রমে। টাকা পয়সার অভাব নাই। তাই শওকতের বাপ তোফাজ্জল আলী ছেলেকে সরকারী হাসপাতালে না নিয়ে শাহবাগে বারডেম হাসপাতালেই নিয়ে এসেছেন।

সকালে পুরো পরিবার হাসপাতালে এসেছিলো শওকতকে নিয়ে। দুপুরের মধ্যেই শওকতের ঠাঁই হয়েছে চার তলার উপর সুন্দর একটা ছিমছাম কক্ষে। এক্সরে ফেক্সরে করা, পরীক্ষার জন্য রক্ত টক্ত নেয়া সব শেষ। ডাক্তার দেখে গেছেন কয়েক-বার। রাত আটটার দিকে তোফাজ্জল আলী ছেলে-মেয়ে নিয়ে বাড়ী চলে গেছেন স্ত্রীকে রেখে। শওকতের মা রাত্রে থাকবেন ছেলের সাথে। মোসাদ্দেক আলী গদিতে ছিল বলে সবার সাথে আসতে পারেনি; এসেছে সন্ধ্যার সময়। ঠিক করেছে, ভাইপোকে রাত দশটা পর্য্যন্ত সঙ্গ দিয়ে ধীরে সুস্থে বাড়ী ফিরবে।

মোসাদ্দেক আলী বেশ গাট্টা গোট্টা চেহারার যুবক। ইচ্ছা করলে, যে কোন নাটক কিংবা সিনেমায় খুনীর চরিত্রে ওকে সহজেই নামিয়ে দেয়া যায়। পড়াশুনা বেশী করেনি। এইস, এস, সি তিনবার ফেল করার পর, ভাইয়ের সাথে পৈত্রিক ব্যাবসায় লেগে গেছে। বড় ভাই যাবার পর, মোসাদ্দেক আলীর সিগারেট খাবার ইচ্ছা হলো। হাসপাতালের ভেতরে সিগারেট খাওয়া নিষিদ্ধ বলে নীচে নেমে এসেছিলো সিগারেট খেতে। নেমে দেখে, সিগারেটও শেষ। তাই সিগারেট কিনতে ফুটপাতে এসেছে।

এক প্যাকেট সিগারেট কিনলো মোসাদ্দেক আলী, সাথে একটা পান। পয়সা দিতে যাবে, এমন সময় কোথা থেকে ছুটে এলো এক বিশ-বাইশ বছরের ছোকড়া।

এক প্যাকেট বেনসন দে তো। দোকানীকে হুকুম দিল ছেলেটা কর্কশ কণ্ঠে।

নান্টু ভাই, সকালেই ত নিলেন এক প্যাকেট। চোখ মাটির দিকে নামিয়ে নীচু স্বরে বললো দোকানদার লোকটা। এখন আবার চান।

কি কইলি ...। একটা বাজে গালি দিলো ছোকরা। আর একটা কথা কবি ত, ভুড়ি ফালাইয়া দিমু।

দোকানদার লোকটা আর কোন কথা না বলে বেনসনের একটা প্যাকেট এগিয়ে দিলো ছোকরার দিকে। ছোকরা প্যাকেটটা নিয়ে বীরের মত হেলে দুলে চলে গেল।

এদের জ্বালায় কি কইরা ব্যাবসা করি কন। মাসে মাসে চাঁদা দিতে হয়। তার উপর সময় নাই, গময় নাই, যখন তখন পান নেয়, সিগারেট নেয়, কোক-ফান্টা নেয়। নিজের মনের ক্ষোভটা উজাড় করে দেয় দোকানদার লোকটা।

মোসাদ্দেক আলী ভাবলো, ছোকরাকে ডেকে দু কথা শুনিয়ে দেবে। নিজের এলাকা হলে তাই করতো। কিন্তু হাসপাতালের এই অপরিচিত পরিবেশে তার সাহসে কুলালো না ওই ছোকরাকে কিছু বলতে । দোকানীকে পয়সা দিয়ে পথে নামলো সে। পানটা গালে পুরে, সিগারেট ধরিয়ে ভাবলো, একটু হাটবে এদিক ওদিক। হাটতে হাটতে শাহবাগের মোড়ের টেনিস কমপ্লেক্স এর কাছে আসতেই লোকটার উপর নজর পড়লো তার। একজন বুড়ো লোক - বয়স বোধ হয় ষাটের কাছাকাছি, ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আছে একটা বিরাট বোচকা হাতে, রাস্তার যানবাহনের অন্তহীন স্রোতের দিকে ঘোলাটে দৃষ্টি মেলে। মোসাদ্দেক আলীর সিক্সথ সেন্স বললো, লোকটা বোধহয় কোন বিপদে পড়েছে। সে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলো লোকটার দিকে।

মিয়া ভাই, কই যাইবার লাগছেন?

মোসাদ্দেক আলীর উচ্চ কণ্ঠের প্রশ্নে বুড়ো রুস্তম আলী চমকে উঠে তাকিয়ে দেখেন, সালোয়ার-কুর্তা গায়ে বিরাট একটা লোক তাকিয়ে আছে তার দিকে। ঠোঁটের কোন বেয়ে পানের পিক গড়িয়ে পড়ছে, মনে হচ্ছে যেন রক্ত ঝরছে। হাতে একটা জলন্ত সিগারেট।

হাসপাতালে যামু। ক্ষীন কণ্ঠে বলেন রুস্তম আলী।

হইছে কিডা? আবার বাজখাঁই গলায় প্রশ্ন।

আমার কিছু না। পোলাডার এক্সিডেন্ট হইছে। মানুয জন হাসপাতালে লইয়া গেছে। মোবাইলে কারা আমাগো ইদ্রিস চেয়ারম্যানরে খবর দিলো। তিনিই আমারে খবরটা দিয়া কইলেন, হাসপাতালের নাকি অনেক খরচ - রক্ত কেনা, অষুধ কেনা। টাকা না পাইলে পোলাডার চিকিৎসা হইবোনা। আমি গিরস্ত মানুষ, টাকা পামু কই। ধার দেনা কইরা ছুইটা আসলাম।

আইছেন কোহান থেইকা?

মহব্বত পুর। পাবনা থেইকা সাত মাইল দূর। বাসে এইখানে নামাইয়া দিলো একটু আগে। পথ ঘাট চিনি না। এখন কেমনে হাসপাতালে যাই.....।

ছেলে কি করতো?

কি আর করবো? রাজ-মিস্তিরির যোগালীর কাম করতো। মাচা ভাইঙ্গা পইড়া হাত-পা ভাংছে, মাথায় চোট লাগছে।

কোন হাসপাতালে আছে?

ঢাকা হাসপাতাল।

ঢাকা হাসপাতাল? মোসাদ্দেক আলী তাকায় স-প্রশ্ন দৃষ্টিতে।

হ, ঢাকা হাসপাতাল। ইদ্রিস চেয়ারম্যান কইছে, ঢাকার মইধ্যে সব চে বড় হাসপাতাল। যারে কমু, হেই চিনাইয়া দিবো।

মোসাদ্দেক আলী মনে মনে ভাবতে থাকে। প্রাইভেট হাসপাতাল হবার কথা নয়। সরকারী হাসপাতালগুলোর মধ্যে ঢাকা মেডিক্যালের কথাই প্রথম মনে পড়লো তার।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল? বুড়োর দিকে আবার স-প্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায় মোসাদ্দেক আলী।

হ হ, ওই টাই।

মোসাদ্দেক আলীর বড় কষ্ট হল বুড়োর কথা শুনে। আহারে, ছেলের এক্সিডেন্টের কথা শুনে এতদুর থেকে ছুটে এসেছেন ধার দেনা করে। ভাবলো, বুড়োকে একটা রিক্সা কিংবা স্কুটার ধরিয়ে দেয়। কিন্তু সাথে ভাবলো, রিক্সা কিংবা স্কুটারে হাসপাতালে পৌছালেও ছেলের সাক্ষাত যে বুড়ো পাবে, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। সেখানেও হাজার রকম দালাল বসে আছে, এ' ধরনের লোকদের হেনস্তা করার জন্য।

সে মনে মনে ঠিক করলো, বুড়োকে হাসপাতালে ছেলের কাছে পৌছে দিয়ে তারপর বাড়ী যাবে।

ঠিক আছে। হাসপাতালটা কাছেই। হাত তুলে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের দিকে ইঙ্গিত করে মোসাদ্দেক আলী। আপনে এখানে খাড়ান। আমি যামু আর আসমু। আমার ভাইপোডা আছে এই হাসপাতালে, সঙ্গে হের মা। বারডেমের দিকে দিকে ইঙ্গিত করে সে। ওগোরে বইলা আসি। কোন চিন্তা নাই। আপনেরে আমি আপনার পোলার হাসপাতালে পৌছাইয়া দিয়া আসুম। এখানে এহানে বইসা থাকেন । আমি যামু আর আসমু।

মোসাদ্দেক আলী হনহন করে ছুটলো বারডেম হাসপাতালের দিকে। লোকজন কমে আসছে রাস্তায়। যদিও সব কিছু দেয়া হয়েছে, তবু ভাবীর কাছে গিয়ে জানতে হবে, ওদের আর কিছু লাগবে কি না। নার্সদের সাথেও একটু আলাপ করে আসতে হবে, যদি শেষ মুহুর্তে কিছুর প্রয়োজন হয়। সব কাজ সারতে কতক্ষন লাগে কে জানে। তার পর বাড়ী ফেরার পালা। পথে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল পড়বে। বুড়োকে ওখানে নামিয়ে ছেলের সাথে দেখা করিয়ে তবে ছুটি।

ভাবছেন বুড়ো রুস্তম আলীও। নিজের বোকামিতে নিজের উপর রাগ হচ্ছে তার। চেয়ারম্যান ইদ্রিস আলী বারবার বলে দিয়েছেন, ঢাকা শহর হলো ঠকের মুল্লুক। কই যাবা, সবারে কবা না। মানুষে কিছু দিলে খাবা না। গাড়ী ঘোড়ায় উঠতে সাবধান। এক যাগার নাম কইয়া অন্য যাগায় নিয়া তোমারে ফতুর কইরা দিবো। ষন্ডা মার্কা এই লোকটাকে কেন যে সে সব বলতে গেলো। বিশেষ করে, টাকা পয়সার ব্যাপারটা। লোকটার কথা বার্তা সুবিধার না। কেমন ক্যাট ক্যাট করে কথা বলে। এখন লোকটা হয়তো

ওর সঙ্গী সাথীদের ডাকতে গেছে। এখন কি করবে সে? রাস্তা ঘাট চিনলে না হয় পালানো যেত। হাতের বোঝাটাও বেশ ভারী। ছেলের মা ছেলের জন্য অনেক খাবার দাবার দিয়ে দিয়েছেন। হাতের বোঝাটা না থাকলে একদিকে চটপট সটকে পড়া কঠিন ছিলনা। রুস্তম আলী এক বার ভাবলেন, বোঝাটা ফেলে রেখেই পালাবেন। কিন্তু ছেলের জন্য আনা খাবারগুলো ফেলে যেতে মন চাইলোনা তার। ভাবলেন, একটা রিক্সা নেবেন। কিন্তু সাহস হলো না।

রাস্তাটা পেরিয়ে ওপাশে যেতে পারলে লোকটার খপ্পর থেকে বাঁচা যেতে পারে, এই ভেবে রাস্তা পার হবার উদ্যোগ নেন রুস্তম আলী। কয়েকটা যন্ত্রযান এক যোগে তেড়ে আসে তাকে, প্রচন্ড শব্দে হর্ন বাজিয়ে। ভয়ে তার অন্তরাত্মা খাঁচাছাড়া হবার যো। তাড়াতাড়ি পেছনে সরে আসেন তিনি। পেছনে সেই ষন্ডা মার্কা লোক, সামনে যানবাহনের অনন্ত মিছিল। তিন বারের চেষ্টায় রাস্তা পার হয়ে তার মনে হয়, তিনি আজরাইলের থাবা থেকে কোন মতে মুক্তি পেয়ে এসেছেন। শিশু পার্কের গেট পেরিয়ে একটু সামনে একটা অন্ধকার যায়গা পেয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিতে নিতে সুরা ইয়াসিন পড়তে থাকেন রুস্তম আলী।

এমন সময় মাটি ফুড়ে উদয় হল দুটো যুবক।

আছছালাম-আলাইকুম চাচা। ওদের একজন বললো অতি মোলায়েম কণ্ঠে।

চমকে উঠে রুস্তম আলী দেখেন, তাকে ঘিরে ধোপ-দুরস্ত কাপড় পরা দুটো ছেলে দাঁড়িয়ে।

ওয়ালাইকুম সালাম। উত্তর দেন তিনি।

কেমন আছেন চাচা? কই যাইবেন? আগের ছেলেটিই বললো। বাকী জন চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলো। একটু বসেন চাচা। দেখলাম, হাতে বোঝা লইয়া অনেকক্ষন ধইরা খাড়াইয়া আছেন। আহারে, বোঝাটা লইয়া আপনার কত কষ্ট হইতাছে। বসেন, একটু জিরাইয়া লন।

ছেলে দুটো কে দেখে হালে পানি পেলেন রুস্তম আলী। যাই হোক, ওই গুন্ডা লোকটা এ দুটো ভদ্র ছেলের সামনে কিছু করবার সাহস পাবে না।

না না বাবা, আমার জিরানোর সময় নাই। পোলাডা এক্সিডেন্ট কইরা হাসপাতালে। হের চিকিৎসার লাইগা টাকা পয়সা দরকার। আমার এক্ষুনি হাসপাতালে যাওন দরকার।

হায় হায়। কন কি! কোন হাসপাতালে?

মেডিক্যাল কলেজ না কি কয়, সেই হাসপাতালে।

কোন চিন্তা নাই চাচা। এই যে মাজেদ, সঙ্গীকে দেখায় ছেলেটা। ওর ভাই কাম করে অই হাসপাতালে। আপনার পোলার চিকিৎসার আর কোন চিন্তা নাই। চলেন, আপনারে হাসপাতালে লইয়া যাই।

একটা প্রচন্ড ভয় গ্রাস করেছিল রুস্তম আলীকে গ্রহনের মত। দুজন ফেরেস্তা সেই গ্রহনের অন্ধকার কেটে মুক্ত করে নিয়ে যাচ্ছে তাকে। ভয় থেকে নির্ভয়ের পথে। মনে মনে খোদার কাছে হাজার শোকর আদায় করেন তিনি।

একটা বেবীট্যাক্সি থামে শিশু পার্কের সামনে, ফুটপাতের গা ঘেষে।

এই মাজেদ, মুরুব্বীর সন্মান করা এখনো শিখলি না। চাচা মিয়া কষ্ট কইরা বোঝা টানতাছে, আর তুই নবাবের মত পকেটে হাত দিয়া হাটতাছস । তোর লজ্জা করে না? প্রথম ছেলেটার কথায় লজ্জা পায় মাজেদ।

পোটলাটা আমার হাতে দেন চাচা, বলে দেয়ার অপেক্ষা না করেই রুস্তম আলীর হাত থেকে বোঝাটা নিজের হাতে টেনে নেয় মাজেদ।

তিন জনের দলটি এগিয়ে যায় বেবীট্যাক্সিটার দিকে।

মোসাদ্দেক আলী মোটা সোটা শরীর নিয়ে রীতিমত হাফাচ্ছে ফুটপাতের উপর। দেরী হবে বলে লিফটের জন্য অপেক্ষা করে নি। সিড়ি বেয়ে নীচে নেমে এসেছে দ্রুত বেগে। নীচে নেমেও থামেনি। একছুটে চলে এসেছে বুড়োকে খুজতে।

না, জায়গায় নেই বুড়ো। টেনিস কমপ্লেক্স এর সামনের ফুটপাথটা দুবার চক্কর দেয় সে শাহবাগের মোড় পর্য্যন্ত। না, কোথাও নেই। কোথায় গেলো লোকটা? নিজকেই প্রশ্ন করে মোসাদ্দেক আলী। কই আর যাবে, আশেপাশে আছে কোথাও হয়তো। মনকে প্রবোধ দেয় সে। হঠাৎ রাস্তার উলটো দিকে, শিশু পার্কের গেটের পাশে তাকাতেই বুড়োর উপর চোখ পড়ে মোসাদ্দেক আলীর।

হেটে যাচ্ছেন বুড়ো একটা বেবীট্যাক্সির দিকে। তাকে ঘিরে দুজন যুবক। লাইটপোষ্টের আলোয় নান্টু নামের ছোকরাটাকে চিনতে কষ্ট হয়না তার। মোসাদ্দেক আলী চলমান গাড়ীর স্রোত উপেক্ষা করে, দ্রুত বেগে রাস্তা পেরিয়ে ছুটলো বেবীট্যাক্সিটার দিকে হাফাতে হাফাতে। কিন্তু, পৌছানোর আগেই ছেড়ে দিলো সেটা; শাহবাগের গোল চক্কর ঘুরে ছুটে চললো ফার্ম গেটের দিকে, মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালকে পেছনে ফেলে।

অপসৃয়মান বেবীট্যাক্সিটার পেছনের দুটো লাল আলো যেন রক্ত চক্ষু মেলে তাকিয়ে থাকলো ওর দিকে।

সিডনী এপ্রিল ২৪-২৫, ২০১০